আলোর পথযাত্রী

bengaltimes.in

সূচিপত্র

মাত্র এক টাকায় কেনা হয়েছিল সল্টলেক!
❑ সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বপ্নের নগরী সেভাবে বেড়ে উঠল কই!
❑ জগবন্ধু চ্যাটার্জি

পৃথিবীর 'হায়েস্ট পেইড ডক্টর'
❑ স্বরূপ গোস্বামী

বাঁকুড়া থেকেও ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন!
❑ সজল মুখার্জি

তাঁর বাড়িতেই লুকিয়ে ছিলেন জ্যোতিবাবু
❑ সরল বিশ্বাস

আবার জেলে পাঠিয়ে দেব
❑ রাজেশ মিশ্র

পারিশ্রমিক পেলেন দুর্গাপুর
❑ অনির্বাণ বসু

মন্ত্রীকে বললেন, রোজ হাঁড়িয়া খাও
❑ তরুণ পট্টনায়েক

পথের পাঁচালীর টাকা এসেছিল পিডব্লুডি থেকে
❑ সংহিতা বারুই

একটি আটপৌরে সভা
❑ সেঁজুতি সেনগুপ্ত

একটি পেরেকের কাহিনী
❑ উত্তম জানা

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। আই এস এস এন: ২৪৪৫–৫৬৫৭। ফোন: ০৩৩ ৪০৬৪৫৭৯৮/৯৮৩১২২৭২০১। ই মেল: bengaltimes.in@gmail.com ওয়েবসাইট: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ। একদিকে দাঙ্গায় স্বজনহারানোর যন্ত্রণা। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। অন্যদিকে, ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর স্রোত। সে বড় সুখের সময় ছিল না। এমন একটা কঠিন সময়েই তাঁকে বাংলার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

চিকিৎসক হিসেবে দেশজোড়া খ্যাতি। গান্ধীজি থেকে রবীন্দ্রনাথ, নেহরু থেকে রাধাকৃষ্ণান– দিকপাল মানুষেরা যখনই গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন, তাঁকেই ছুটে যেতে হয়েছে। এরই ফাঁকে কখনও কলকাতার মেয়র, কখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কিন্তু গোটা রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়া এক অন্যরকমের চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি পিছিয়ে যাননি।

এখানেও তিনি দারুণভাবেই সফল। তিনি বড় চিকিৎসক না বড় প্রশাসক, এই নিয়েও সুন্দর একটা তর্ক হতেই পারে। আসলে, প্রশাসক হিসেবে এতটাই সাড়া ফেলেছিলেন, এই তুলনাটা এসেই যায়। একই সত্তার দুই ভিন্ন স্রোত। দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনের মতো শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি সল্টলেক, কল্যাণীর মতো নগরী গড়ে উঠল তাঁর আমলেই। কলকাতা কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সারা বাংলাই যেন উন্নয়নের ছোঁয়া পেল। বাংলা সত্যিই তখন সারা ভারতকে পথ দেখাত। বিধানচন্দ্র রায়ের নামের পাশে ‘বাংলার রূপকার’ তকমাটা এমনি এমনিই আসেনি। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতেও হয়নি। পরিসংখ্যানই যেন তাঁর হয়ে কথা বলে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, মাত্র চোদ্দ বছরে যে বিরাট কর্মকাণ্ড তৈরি করে গেছেন, পরের আঠান্ন বছরে সেই উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখা গেল না কেন? সে প্রশ্ন তোলা থাক। এই সংখ্যায় সেই কিংবদন্তী মানুষটিকে শ্রদ্ধা। সেই সময়টাকে একটু ফিরে দেখা।

মাত্র এক টাকায় কেনা হয়েছিল সল্টলেক!

মাত্র এক টাকায় কেনা হয়েছিল সল্টলেক? কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন বিধানচন্দ্র রায়? স্মৃতিচারণে প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত।

সল্টলেকে জমির দাম কত? কত হতে পারে, অনুমান করুন। তাহলে, গোটা সল্টলেকের দাম কত? মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা। অথচ, গোটা সল্টলেকের দাম ধার্য হয়েছিল মাত্র এক টাকা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আর এই কান্ডটাই করে দেখিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র রায়।

স্বাধীনতার পর তখন পিলপিল করে ওপার বাংলা থেকে আসছে উদ্বাস্তুরা। ছড়িয়ে গেল বাংলার নানা জায়গায়। এত এত মানুষ থাকবে কোথায়? খাবে কী? কর্মসংস্থানই বা হবে কোথায়? সমস্যা বেশ গুরুতর। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সামনে বড় এক চ্যালেঞ্জ। একদিন ডেকে পাঠালেন প্রফুল্ল সেনকে।

মন্ত্রীসভার কাজ চালানোর ব্যাপারে প্রফুল্লবাবুর ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। প্রফুল্লবাবুকে নিজের ঘরে ডেকে বললেন, পূর্ব কলকাতায় অনেক জলা জমি আছে। অনেক ভেড়ি আছে। সেগুলি বুজিয়ে ফেলতে হবে। এবং এই কাজটা তোমাকেই করতে হবে। শুনেই মাথায় হাত প্রফুল্ল সেনের। তিনি বললেন, ‘সেটা কী করে সম্ভব? পুরো জায়গাটাই তো আমাদের হেমদার।’ হেমদা মানে, হেমচন্দ্র নস্কর, বিধান রায়ের ক্যাবিনেটে তিনিও একজন মন্ত্রী। বয়সে বিধানবাবুর থেকেও বড়। তাঁর জায়গা নিয়ে নেওয়া হবে! বিধানচন্দ্র বললেন, ‘যেভাবে হোক হেমদাকে বুঝিয়ে রাজি করাও।’

প্রফুল্ল সেন পড়লেন মহা সমস্যায়। খোঁজ নিলেন সেচমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্করের। তখনও তিনি মহাকরণে ঢোকেননি। আধঘণ্টা পর পর ফোন হেম নস্করের ঘরে। এবার হেম নস্কর বললেন, কী ব্যাপার বলো তো। তোমরা তো আমাকে মন্ত্রী বলে মনেই করো না। আমাকে কোনও গুরুত্বই দাও না। আজ হঠাৎ এতবার খোঁজ কেন? ঠিক আছে, তোমার ঘরে যাচ্ছি।’ প্রফুল্ল সেন বললেন, ‘আপনাকে আসতে হবে না, আমি আপনার ঘরে আসছি। ডাক্তার রায়ের আপনাকে দরকার।’

হেম নস্করকে একরকম পাকড়াও করেই নিয়ে গেলেন বিধান রায়ের কাছে। হেম নস্কর ভাবলেন অন্য কথা। বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। মাছ লাগবে তো! ঠিক আছে, আপনাকে বড় মাছ পাঠিয়ে দেব। আর প্রফুল্ল, তমিও তো মাছ খেতে ভালবাস। তোমাকেও মাছ পাঠিয়ে দেব।' তখন বিধান রায় বললেন, 'না না, মাছের কথা বলছি না। প্রফুল্ল, হেমদাকে বুঝিয়ে দাও আমরা কী করতে চাইছি।'

প্রফুল্লবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'হেমদা, আমরা পূর্ব কলকাতায় একটা নতুন উপনগরী করতে চাইছি। তার জন্য আপনার ওই ভেড়িগুলো বুজিয়ে ফেলতে চাই।' শুনেই আঁতকে উঠলেন হেম নস্কর। ওগুলো দিয়ে দিলে আমি খাব কী?' বিধানবাবুও ছাড়ার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'আপনার অনেক টাকা আছে। ওগুলো না থাকলেও আপনার দিব্যি চলে যাবে। সরকারের হাতে টাকা নেই, তাই আপনার যা প্রাপ্য, সেই দাম দিতে পারব না। তবে একেবারে বিনামূল্যে নেব না। এক টাকা দেব।'

পরিকল্পনা সাজানোই ছিল। ঘরে ঢুকে পড়লেন চিফ সেক্রেটারি। হাতে নকশা। আর জমি হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। ওই ঘরে বসিয়েই সই করিয়ে নেওয়া হল হেম নস্করকে। বেচারা মন্ত্রী! ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই বিধানবাবুর কথায় সই করে ফেলতে হল।

আগে থেকেই সল্টলেকের নকশা তৈরি করে রেখেছিলেন বিধান রায়। ফলে, কাজ শুরু হতে সময় লাগল না। দ্রুত শুরু হয়ে গেল সল্টলেক তৈরির কাজ। পুরো কাজটা বিধানবাবু দেখে যেতে পারেননি। আজকে আমরা যে সল্টলেক দেখছি, তার প্রায় পুরোটাই ছিল বিধান রায়ের পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির ফসল। কিন্তু সেই সল্টলেক যে মাত্র এক টাকায় কেনা হয়েছিল, এটা কজন জানেন!

কীভাবে গড়ে উঠল কল্যাণী শহর? কে এই কল্যাণী? প্রশ্নটা অনেকদিনের। মুখে মুখে ফেরে। রয়েছে নানা জনশ্রুতি। কেউ বলেন, বিধানবাবুর প্রেমিকা। কেউ বলেন, পালিতা কন্যা। আলো ফেললেন জগবন্ধু চ্যাটার্জি।

স্বপ্নের নগরী কল্যাণী সেভাবে বেড়ে উঠল কই!

একটি ছোট্ট শহরে চারখানা রেলস্টেশন! তথ্যটা বেশ অবাক করার মতো। অথচ, কল্যাণী শহরে সত্যিই চারখানা স্টেশন আছে। কল্যাণী, ঘোষপাড়া, কল্যাণী সীমান্ত, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল। দেশের খুব বেশি শহরে এমনটা আছে বলে মনে হয় না। এরকম আরও নানা অবাক করার মতো উপকরণ ছড়িয়ে আছে শহরের আনাচে কানাচে।

এই শহরের জন্মটাই তো অবাক করার মতো। স্রেফ কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষে একটা নগরীর গড়ে ওঠা, ক্রমশ তা বেড়ে ওঠা। যদিও তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর তাঁবু পড়েছিল এই এলাকায়। সৈনিকদের আসা যাওয়ার জন্য কিছু রাস্তাও তৈরি হয়েছিল। তখনও গড়ে ওঠেনি জনবসতি। আসল নির্মাণযজ্ঞ শুরু হল স্বাধীনতার পর, কংগ্রেসের সম্মেলনকে ঘিরে।

তখনকার দিনে এ আই সি সি–র অধিবেশন মানে বিরাট এক মহোৎসব। দেশের তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতারা আসতেন। বেশ কয়েকদিন ধরে থাকতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা দিক নির্ণয়ের পাশাপাশি এলাকায় যেন একটা মেলা বসে যেত। বিভিন্ন দোকান বসত। রাজনৈতিক মঞ্চের পাশাপাশি হত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত। স্থানীয় আয়োজকরা কী রকম আয়োজন করলেন, তার ওপর তাঁদের গুরুত্ব নির্ভর করত। কেউ দারুণভাবে আয়োজন করলে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব একলাফে বেড়ে যেত। তাই বিভিন্ন রাজ্যের নেতাদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকত অন্যদের টেক্কা দেওয়ার।

সালটা ১৯৫০। সেবার এআইসিসি অধিবেশন বাংলাতেই হওয়ার কথা। কিন্তু কোথায় করা যায়? এমন জায়গা, যেখানে রেল যোগাযোগ থাকবে, যাতায়াতের ভাল রাস্তা থাকবে। থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকবে। চাইলে হয়ত কলকাতাতেই করা যেত। অথবা অন্য কোনও শহরকেও বেছে নেওয়া যেত। কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ নিতে চাইলেন বিধানচন্দ্র রায়। ঠিক করলেন, কলকাতায় হবে না। অন্য কোনও পরিচিত শহরেও হবে না। নতুন একটা অখ্যাত জায়গায় হবে এই সম্মেলন। সম্মেলন উপলক্ষেই গড়ে উঠবে নতুন নগরী। কোথায় করা যায়? কলকাতার উপকণ্ঠেই একটা জায়গা বেছে নিতে হবে। বসলেন বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ ও স্থপতির সঙ্গে। প্রাথমিকভাবে তৈরি করে ফেললেন শহরের নকশা। শুরু হয়ে গেল নতুন নগরী গড়ে তোলার কাজ। একটি অংশে বিস্তীর্ণ জায়গা ছেড়ে রাখলেন শিল্প স্থাপনের জন্য। এক জায়গায় সরকারি প্রতিষ্ঠান, তো আরেক অংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি অংশে আবাসন। কোথাও খেলার মাঠ, কোথাও বিনোদন কেন্দ্র। কোথাও জলাশয়, কোথাও বনসৃজন। সবমিলিয়ে পরিকল্পনার স্পষ্টছাপ। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে এত বছর আগে এরকম এক আধুনিক উপনগরীর কথা কীভাবে ভেবেছিলেন! তিনি

যে কতখানি দূরদর্শী, তা সেই পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যায়।

কিন্তু শহরের নাম কী হবে? ঠিক করলেন, কল্যাণী। কে এই কল্যাণী? এ নিয়ে নানা জল্পনা। কেউ বলেন, বিধানবাবুর প্রেমিকা। যাঁর সঙ্গে তাঁর শেষমেষ বিয়ে হয়নি। সেই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই কল্যাণী নামের নগরী। কেউ বলেন, কল্যাণী নামের একটি অনাথ মহিলাকে ছোট থেকেই বিধানবাবু নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। সেই পালিতা কণ্যার নামেই উপনগরী। এই দুই জনশ্রুতির কথাই কিন্তু জেলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু অন্যরকম কথাই উঠে এল গবেষক তমাল সাহার কথায়। কল্যাণীর এই শিক্ষাবিদ দীর্ঘদিন ধরে বিধানবাবুর জীবনের নানাদিক নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, ‘কল্যাণী বিধানবাবুর প্রেমিকা না পালিতা কন্যা, এই নিয়ে বিতর্ক আছে। নানা জনশ্রুতিও আছে। কিন্তু আমি গবেষণা করতে গিয়ে এমন কিছুই খুঁজে পাইনি। কল্যাণী বলে কেউ ছিল বলে মনে হয় না। আসলে, কল্যাণ মানে তো উন্নয়ন। তখন উন্নয়ন

কথাটার তেমন চল ছিল না। কথায় কথায় লোকে বলত, এলাকার কল্যাণ হোক, মানুষের কল্যাণ হোক। সেই কল্যাণের প্রতিক হিসেবেই নাম রাখা হয়েছে কল্যাণী।’

নিশ্চয় খুব ধুমধাম করে শহরের উদ্বোধন হয়েছিল! একেবারেই না। কংগ্রেস অধিবেশন ছাড়া শহরের উদ্বোধনকে ঘিরে আদৌ কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল, এমনটা শোনা যায় না। শুধু তাই নয়, অধিবেশনের পরেও আরও বারো বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানবাবু। তমালবাবুর দাবি, এই বারো বছরে আর কখনও কল্যাণী এসেছেন, এমন কোনও প্রামাণ্য নথিও নেই। তবে কল্যাণীকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব একটা ভাবনা ছিল। খোঁজ খবর রাখতেন। মনের মধ্যে একটা আলাদা দুর্বলতা ছিল। তিনি বেঁচে থাকলে আরও বড় বড় শিল্প আসত কল্যাণীতে। শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব ব্যাপারেই এগিয়ে যেত কল্যাণী। কিন্তু সেই উন্নয়ন একটা সময়ে থমকে গিয়েছিল। সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি কল্যাণীকে। নইলে রাজ্যের প্রথম তিনটি শহরের মধ্যে উঠে আসত কল্যাণীর নাম।’ কেন সেভাবে বেড়ে উঠল না কল্যাণী? আক্ষেপ আছে, সমালোচনা আছে।

চাপানোতরও আছে। আছে একটা গর্ববোধ। সবমিলিয়েই কল্যাণী। রয়েছে নানা মুখরোচক গল্প। ছড়াতে ছড়াতে তা নিয়েছে জনশ্রুতির চেহারা। ইতিহাস যাই বলুক, তথ্য-প্রমাণ যাই বলুক, বিশ্বাস হয়ে গেঁথে আছে মনের ভেতরে।

পৃথিবীর হায়েস্ট পেইড ডক্টর

স্বরূপ গোস্বামী

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বাড়িতে নিয়ম করে রোগী দেখতেন বিধানচন্দ্র রায়। কারও কাছেই কোনও ভিজিট নিতেন না। একেবারেই নিখরচায়। সেই বিধানচন্দ্রই ভিজিট চেয়ে নিয়েছিলেন বিশেষ একজনের কাছে। তিনিও আবার যেমন তেমন রোগী নন। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ড জন কেনেডি।

এই ভিজিট চাওয়ার পেছনে রয়ে গেছে মজার এক কাহিনী। যা পরবর্তীকালে অনেকেই লিখে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের বিদেশ সফর নতুন কিছু নয়। ঘটা করে অফিসার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীদের বগলদাবা করে বিদেশ সফর অনেক মুখ্যমন্ত্রীই করে থাকেন। কিন্তু বিদেশ সফরে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতির চিকিৎসা! এমনটা আর কারও ক্ষেত্রেই ঘটেনি। চিকিৎসা তো দূরের কথা। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করতে পেরেছেন বলেও জানা নেই। এটা সম্ভব হয়েছিল তিনি বিধান রায় বলেই।

ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে একটি মার্কিন সংস্থার মউ চুক্তি হওয়ার কথা। অর্থাৎ, সেই সংস্থা প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে। সেই কারণেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আমেরিকা যাত্রা। হাতে কয়েকদিন বাড়তি সময় নিয়েই গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল। এবার তিনি ঠিক করলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করবেন। আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূতকে বললেন, যেভাবে হোক, আমার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করো। কিন্তু রাষ্ট্রদূত সাফ জানিয়ে দিলেন, এভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া যায় না। এভাবে হুট করে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না। তাছাড়া, তিনি দেখা করলে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করবেন। এভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কেন? এটা প্রোটোকলে আটকে যাবে।

কিন্তু বিধান রায়ও নাছোড়। তিনি এসেছেন যখন, দেখা করেই যাবেন। বুঝলেন, রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে হবে না। সেখান থেকে ফোন করে বসলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে। বললেন, জওহর, আমি এখানে এসেছি যখন,

তখন কেনেডির সঙ্গে দেখা করেই যাব। কিন্তু তোমার রাষ্ট্রদূত আমাকে প্রোটোকল বোঝাতে শুরু করেছে। এই বয়সে ওসব বুঝে আমার কাজ নেই। তুমি ওকে বলো, ও যেন প্রেডিডেন্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে।

নেহরু জানতেন, বিধান রায় যখন জেদ ধরেছেন, তখন দেখা করেই ফিরবেন। তাঁকে প্রোটোকল বুঝিয়ে লাভ হবে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে রাষ্ট্রদূত চেষ্টা করলেন কেনেডির অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করার। তিন দিন পর সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেল। কেনেডির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। দুই দেশের ঐতিহ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক, উন্নয়ন–এসব নিয়েই মূলত আলোচনা। বিধান রায়ের সঙ্গে কথা বলে তখন অনেকটাই মুগ্ধ কেনেডি। ঠিক এমন সময়েই মোক্ষম কথাটি বলে ফেললেন বিধান রায়। তিনি বললেন, আমি শুনেছি, আপনি পিঠের ব্যথা নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমি কি আপনার চিকিৎসা করতে পারি? কেনেডি সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলেন। বিধান রায় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। পুরনো কী কী ওষুধ ব্যবহার করতেন, সেগুলো দেখতে চাইলেন। সেগুলো দেখার পর বললেন, এতদিন আপনার ভুল চিকিৎসা হয়েছে। কয়েকদিন আপনি আমার কথা শুনে চলুন। আমি নিশ্চিত, আপনি ফল পাবেন। প্রয়োজনে আমি আবার এসে আপনার চিকিৎসা করে যাব।

তারপরই বিধান রায় বলে বসলেন, দেখা হল। চিকিৎসাও হল। কিন্তু আপনি ডাক্তারির ভিজিটটা দেবেন না?

মার্কিন প্রেসিডেন্টের চিকিৎসা করাই যে

কোনও ডাক্তারের চরম সৌভাগ্য। সারা জীবন এটাকে ভাঙিয়েই নিজেকে যে কেউ জাহির করবেন। সেখানে এই ডাক্তার কিনা ভিজিট চেয়ে বসলেন! তাঁর কাছে যে এভাবে কোনও ডাক্তার ভিজিট চাইতে পারেন, কেনেডি ভাবতেও পারেননি। মনে মনে হয়ত এই সাহসকে তারিফই করলেন। হতচকিত কেনেডি বললেন, বলুন, কত ভিজিট চান!

বিধান রায় বললেন, আমার জন্য কিছুই চাই না। কিন্তু আমার রাজ্যের জন্য আপনার সাহায্য চাই। আপনি যদি তিনশো কোটি টাকা সাহায্য করেন, তাহলে আমার রাজ্যকে আরও ভালভাবে সাজাতে পারি। এভাবে কেউ কখনও তাঁর কাছে অনুদান চেয়েছেন কিনা জানা নেই। তবে বিধানবাবুর এই সৎ স্বীকারোক্তি কেনেডির মনকে ছুঁয়ে গেল। তিনি বলতেই পারতেন, ভেবে দেখছি। বলতেই পারতেন, পরে জানাব। কিন্তু সেসব রাস্তাতেই গেলেন না। সরাসরি বলে দিলেন, আমি রাজি। তবে আপনার দেশের অর্থমন্ত্রীকে বলবেন, আমাকে একটা চিঠি লিখতে। আমি অবশ্যই পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু ফিরে এসেও নতুন জটিলতা। তখন অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। বিধান রায় তাঁকে বললেন, কেনেডিকে চিঠি লিখতে। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনিও আইন আর প্রোটোকলের ফ্যাকড়া দেখাতে শুরু করলেন। তিনিও সেই রাষ্ট্রদূতের মতোই বলে বসলেন, একটা রাজ্যের জন্য এভাবে অন্য দেশের কাছে টাকা চাওয়া যায় না। কাল অন্য রাজ্যগুলোও এই দাবি করতে পারে। তাছাড়া, এই চিঠি লিখলে দুই দেশের

সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। আমি এটা করতে পারব না।

বিধান রায় তাঁকে বোঝালেন, আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আমাকে কথা দিয়েছেন। তুমি চিঠি পাঠালেই হবে। এটা জাস্ট একটা ফর্মালিটি। এতে দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। বুঝিয়ে দিলেন, তুমি চিঠি না দিলেও টাকা আসবে। শুধু এই বুড়ো বয়সে আমাকে আরেকবার যেতে হবে।

কিন্তু মোরারজি তাতেও রাজি নন। তিনি বিধান রায়ের এই ‘অদ্ভুত’ আবদারের কথা নেহরুকে শোনালেন। ভেবেছিলেন, নেহরু তাঁর কথায় সায় দেবেন। কিন্তু হল উল্টোটা। নেহরু মোরারজিকে বললেন, বিধান রায়কে ঘাঁটিও না। উনি যা বলছেন, তাই করো। উনি নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করেই এসেছেন।

অবশেষে অর্থমন্ত্রী চিঠি পাঠালেন। ততদিনে বিধান রায়ের ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। ফলে, তাঁর প্রতি কেনেডির মুগ্ধতা আরও কিছুটা বেড়েছে। চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই বাংলার জন্য তিনশো কোটির অনুমোদন চলে এল। সেই সময়ের তিনশো কোটি। এই সময় হলে সংখ্যাটা কত দাঁড়াত!

এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল বিধান রায়ের জন্যই। কোনও প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করেই তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে ওই বিশাল অঙ্কের অনুমোদন আদায় করে এনেছিলেন। পৃথিবীর আর কোনও ডাক্তারের ভিজিট তিনশো কোটি হতে পারে!

এই একটা ব্যাপারে শুধু দেশের নয়, পৃথিবীর সব ডাক্তারকে এক লহমায় অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছেন। তিনিই পৃথিবীর হায়েস্ট পেইড ডাক্তার।

বাঁকুড়া থেকেও ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন বিধানচন্দ্র!

সজল মুখার্জি

তাঁর জন্মের তারিখ ১ জুলাই। মৃত্যুর তারিখও সেই ১ জুলাই। বাঙালিকে আর নামটা বলে দেওয়ার দরকার নেই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর জন্মদিন পালিত হয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে। কিন্তু বাঁকুড়ার সঙ্গেও তাঁর একটা সম্পর্ক থেকে গিয়েছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না, ১৯৬২ সালে তিনি এই বাঁকুড়া জেলা থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লড়াই করছেন বাঁকুড়া জেলা থেকে। এমনটা ওই একবারই ঘটেছিল।

হঠাৎ বাঁকুড়ায় দাঁড়াতে গেলেন কেন? তাহলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯৫৭ তে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বৌবাজার কেন্দ্র থেকে। সেবার তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল। সেবার খুব অল্প ভোটে জিতেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র। তাই বাষট্টির নির্বাচনের আগে তিনি কিছুটা সতর্ক হয়ে গেলেন। বৌবাজারের বদলে কেন্দ্র পরিবর্তন করে দাঁড়ালেন চৌরঙ্গিতে। কিন্তু চৌরঙ্গি থেকে জিতবেন, এমনটা হয়ত নিশ্চিত

ছিলেন না। তাই পাশাপাশি আরও একটি কেন্দ্র থেকে লড়াই করার কথা ভাবলেন। সেই কেন্দ্রটি হল বাঁকুড়ার শালতোড়া। নিশ্চয় দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাঁকুড়া জেলাকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ হল, ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই জেলার সব আসনেই জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। সেই কারণেই বাঁকুড়াকে তখন কংগ্রেসের দূর্গ বলা হত। তবে, ১৯৫৭ সালে শালতোড়া বলে কোনও কেন্দ্র ছিল না। ৬২ সালে বিধানবাবু লড়বেন বলেই এই কেন্দ্রটি বানানো হল। যেন জিততে কোনও সমস্যা না হয়, সেই ভেবেই ম্যাপ তৈরি হল। অর্থাৎ, কোন কোন অঞ্চল এই বিধানসভায় থাকবে, কোন কোন অঞ্চল থাকবে না, সেটা সাংগঠনিক ক্ষমতা বুঝে ঠিক করা হয়েছিল। এমনকী ১৯৬৭ থেকে শালতোড়া বলে আর কোনও কেন্দ্র রইল না। তখন থেকে কেন্দ্রটির নাম হয়ে গেল গঙ্গাজলঘাটি। শালতোড়ার একটি অংশ চলে এল ছাতনার সঙ্গে। বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে শালতোড়া আবার ফিরে এল ২০১১ সালে।

আবার বিধানচন্দ্র রায়ের কথাতেই ফেরা যাক। সেই সময় বেশ কয়েকদিন তিনি শালতোড়াতেই ছিলেন। থাকতেন মূলত ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির সরকারি কোয়ার্টারে। সেই সময় তিনি শালতোড়া হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সরকারি চিকিৎসক হয়েও সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে। বিধানবাবুর সঙ্গে হয়ত আগে থেকেই আলাপ ছিল। তাছাড়া, বিধানবাবু নিজেও হয়ত অন্য নেতার বাড়িতে না থেকে একজন ডাক্তারের বাড়িতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

সেই সময় বড় বড় জনসভার তেমন রেওয়াজ ছিল না। তবে বেশ কিছু গ্রামে প্রচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিধানবাবুকে। প্রচারের ফাঁকে বেশ কিছু রোগীও দেখতে হয়েছিল।

তখনও সিপিএমের জন্ম হয়নি। ফলে, মূল লড়াইটা ছিল সিপিআই-এর বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিধানচন্দ্র পেয়েছিলেন ৯৯২৯ টি ভোট। বিশ্বনাথবাবু ৪৫১২। অর্থাৎ জয়ের মার্জিন ৫৪১৭। তখনকার হিসেবে ব্যবধানটা বেশ ভালই। বিরোধীদের আক্রমণের রাস্তায় খুব একটা যেতেন না। বিশেষ কোনও রাজনৈতিক কথাও বলতেন না। বরং, পিছিয়ে পড়া এই এলাকার উন্নয়নের কথাই উঠে আসত তাঁর কথায়। আরও কী কী উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে, কোন কোন দিকে জোর দিতে হবে, সেইসব কথা উঠে আসত।

এলাকার মূলত দুটি সমস্যার কথা বেশি করে ভাবিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই সময় এলাকায় জলের খুব কষ্ট ছিল। যেখানেই প্রচারে গেছেন, মানুষ জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। বিশাল আকারের একটি কুয়ো তৈরি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর লোকমুখে সেই কুয়োর নাম হয়ে যায় বিধান-কুয়ো। সেই কুয়ো এখনও আছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহ করা হত। আরও একটি ব্যাপারে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এলাকায় একটি হাইস্কুল দরকার। সেই স্কুল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে, সরকারি অনুমোদন তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। কারণ, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৬৩ তে সেই স্কুল অনুমোদন পায়। নাম হয় বিসি রায় বিদ্যাপীঠ। সেই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার নুজিবর রহমান এলাকার অবিসংবাদী বাম নেতা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিছুটা নস্টাজিক হয়ে পড়েন নুজিবরবাবু, ‘হ্যাঁ, আমিই ওই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার। যেহেতু বিধানবাবুর উদ্যোগেই ওই স্কুল, তাই আমরাও তাঁর নামেই স্কুলের নামকরণ করেছিলাম।’

সেবার চৌরঙ্গি ও শালতোড়া-দুটি আসনেই জিতেছিলেন বিধানবাবু। নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন ছেড়ে দিতে হত। তিনি চৌরঙ্গি আসনটিই ধরে রেখেছিলেন। জয়ী হয়েছিলেন জানুয়ারিতে। জুলাই মাসের প্রথম দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফলে, আর শালতোড়ায় আসা হয়নি। শোনা যায়, শালতোড়াকে ঘিরেও তাঁর কিছু উন্নয়নে-wwwর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। শালতোড়ার মানুষের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকেই গেছে। যেভাবে দুর্গাপুর, কল্যাণী, সল্টলেক, চিত্তরঞ্জনেরপ মতো শহর গড়ে উঠেছে, বিধান রায় আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে বাঁকুড়া জেলাতেও তেমন কিছু কর্মকাণ্ড হতে পারত। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত বাঁকুড়াও। হয়ত জন্ম হত নতুন কোনও শহরের। সেই আক্ষেপ, সেই দীর্ঘশ্বাস আজও তাড়া করছে পিছিয়ে পড়া বাঁকুড়াকে।

তাঁর বাড়িতেই লুকিয়ে ছিলেন জ্যোতিবাবু!

সরল বিশ্বাস

তখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টি। কেউ কেউ গ্রেপ্তার। কেউ এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুকে। কোথায় তিনি ?

একদিন পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বিধানচন্দ্র কিছুটা ধমকের সুরেই জানতে চাইলেন, কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে জ্যোতি? ওকে ধরা যাচ্ছে না কেন? যেভাবেই হোক, ওকে ধরতে হবে।

শুনেই এক পুলিশকর্তা মুচকি হেঁসে ফেললেন। বিধান রায় জিজ্ঞেস করল, কী হল? হাসছো কেন? এতে হাসির কী হল? জ্যোতিকে ধরা যাচ্ছে না কেন, সেটা জানতে চাইছি।

তখন সেই পুলিশকর্তা বললেন, স্যার, উনি এমন এক জায়গায় আছেন, যেখান থেকে ধরা যাবে না।

বিধানবাবু জানতে চাইলেন, কোথায় আছে ?

সেই পুলিশকর্তা তখন বিধান রায়ের বাড়ির ঠিকানা বললেন।

কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বিধান রায় বললেন, ও, তাই নাকি ? তাহলে থাক। ধরার দরকার নেই।

***

সেবার ক্রুশ্চেভ এসেছিলেন কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানচন্দ্র তো ছিলেনই। ডাকা হয়েছিল বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুকেও। ক্রুশ্চেভের সঙ্গে জ্যোতিবাবু করমর্দন করছেন।

এমন সময় বিধান রায় বলে উঠলেন, ভাল করে দেখে নাও। আমাদের দেশের খুদে লেনিন।

জ্যোতিবাবুর হাসি খুবই বিরল। সচরাচর তাঁকে হাসতে দেখা যেত না। বিধান রায়ের এই কথা শুনে সেদিন জ্যোতিবাবুও নাকি হেসে ফেলেছিলেন।

***

বিধান রায়ের চেম্বার সাজানো হল। কিছু দামী আসবাব আনা হল। এই খরচ নিয়ে বি-ধানসভায় হইচই চলছে। বিরোধীরা চিৎকার করছেন। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, রাজ্যে এত সমস্যা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিলাসিতা করছেন।

বিধানবাবু একটুও রাগলেন না। অনেকক্ষণ চিৎকার শুনলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। জ্যোতি বসুর উদ্দেশে বললেন, ওরা চিৎকার করছে, করুক। জ্যোতি, তুমি কেন ওদের সঙ্গে চিৎকার করছ। আমি তো আর চিরদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকব না। একদিন তোমাকেই তো ওই ঘরে বসতে হবে। তার জন্য আগাম সাজিয়ে দিয়ে গেলাম।

জ্যোতিবাবু কিছুটা যেন লজ্জাই পেলেন। বসে পড়লেন।

***

বাংলা–বিহার সংযুক্তিকরণ নিয়ে বাংলা তখন উত্তাল। বিধানবাবু চাইছেন, বাংলা আর বিহার মিলিয়ে নতুন রাজ্য হোক। কেন্দ্রও তেমনটাই চাইছিল। বিহার সরকারেরও আপত্তি ছিল না।

তার স্বপক্ষে কিছু অর্থনৈতিক যুক্তিও ছিল। কিন্তু বামেদের তীব্র আপত্তি। এমনকী, কংগ্রেসেরও একটা বড় অংশই চাইছে না বাংলা-বিহার মিশে যাক।

একদিন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত আর হেমন্ত বসু কিছু একটা আলোচনা করছিলেন। তখন বিধান রায় বললেন, এত আলোচনার কী আছে! সামনেই তো উপ নির্বাচন। তোমরা তোমাদের কথা বলে প্রচার করো। আমরা আমাদের কথা বলব। দেখা যাক, বাংলার মানুষ কী চায়। কলকাতা উত্তম পশ্চিমের উপ নির্বাচনে বাম প্রার্থী মোহিত মৈত্রর কাছে হেরে গেলেন কংগ্রেসের অশোক সেন। সেই ভোটে সেটাই ছিল মূল ইস্যু।

বিধান রায় এই রায় মেনে নিলেন। বললেন, মানুষ যখন চাইছে না, তখন এই সংযুক্তিকরণ না হওয়াই ভাল। কেন্দ্র-রাজ্য দু জায়গাতেই বিপুল সংখ্যা গরীষ্ঠতা। চাইলেই সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু জনরায়কে খোলা মনে মেনে নিলেন। এমনটা উদারতা সচরাচর দেখা যায় না।

একদিন আড্ডার ছলে জ্যোতি বাবু জানতে চাইলেন, আপনি এমন একটা উদ্ভট কাণ্ড করতে যাচ্ছিলেন কেন? বিধান রায় চাইলে অর্থনৈতিক যুক্তি বোঝাতেই পারতেন। মজা করে বললেন, তোমরা যা জ্বালাতন শুরু করেছো। বিহারে আর যাই হোক, কমিউনিস্ট নেই। দুটো রাজ্য এক হলে তোমাদের তেজ কিছুটা কমত। সেই জন্যই ভেবেছিলাম, দুটো রাজ্য মিলিয়ে দিই।

বেঙ্গল টাইমস
উত্তম স্পেশ্যাল

জুলাই মাস বললেই বাঙালির মনে পড়ে যায় বিশেষ একজনের কথা। মহানায়ক উত্তম কুমার।

জন্ম সেপ্টেম্বরে। অথচ, জন্মের মাসকে ছাপিয়ে গেছে মৃত্যুর মাস। তাই জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ এলেই মহানায়ককে ঘিরে নস্টালজিয়ায় মেতে ওঠে বাঙালি। টিভিতে তাঁর ছবি। কাগজে তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন। উঠে আসে নানা জানা-অজানা দিক।

উত্তম স্মরণে পিছিয়ে থাকবে না বেঙ্গল টাইমসও। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে মহানয়ককে নিয়ে থাকবে একটি বিশেষ সংখ্যা।

কিছু লেখা থাকবে আমন্ত্রিত। পাশাপাশি, পাঠকের জন্যও থাকছে লেখার সুযোগ। দ্রুত লেখা পাঠান বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

১) পিডিএফ নয়, লেখা পাঠান ওয়ার্ড ফাইলে।
২) লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

আবার জেলে পাঠিয়ে দেব

রাজেশ মিশ্র

কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হওয়ায় জেলে গিয়েছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার। জ্যোতিবাবুর বিশেষ বন্ধু। বনেদি ঘরের ছেলে। কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিলেন বাম আন্দোলনের সঙ্গে।

একদিন হঠাৎ জেলখানায় গাড়ি এসে হাজির। শোনা গেল, তাঁকে যেতে হবে মহাকরণ, মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি তলব। স্নেহাংশুবাবু কিছুটা বিস্মিত, 'কী ব্যাপার ? কাউকে ছাড়া হচ্ছে না। হঠাৎ আমার প্রতি এই দয়া?'

অফিসাররা বললেন, আমরা জানি না। মুখ্যমন্ত্রী ডেকেছেন। তিনিই বলতে পারবেন।

আনা হল মহাকরণে। ঘরে ঢুকতেই বিধান রায় আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, স্নেহাংশু, একটা জরুরি কাজে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যাদবপুরে নাকি তোমাদের অনেক জায়গা আছে। আমি ওখানে একটা ইউনিভার্সিটি বানাব। তোমাকে জায়গা দিতে হবে। সর্বহারার পার্টি করো, এত জমি নিয়ে কী করবে ? ওখানে ইউনিভার্সিটি হোক, তুমি চাও না? তবে, এক টাকার বেশি দাম দিতে পারব না।'

বিধানবাবু এমনভাবে বললেন, আর না করার উপায়ই রইল না। চিফ সেক্রেটারিকে আগাম বলা ছিল। তিনি আগেই দানপত্র তৈরি করে রেখেছেন। সই করিয়ে নেওয়া হল স্নেহাংশু আচার্যকে।

যাওয়ার সময় স্নেহাংশুবাবু মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, জমি তো নিলেন। এবার কোথায় পাঠাবেন? বাড়িতে না জেলে?

বিধানবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, অনেকদিন বাড়ির বাইরে আছো। জেলের খাবার ভাল না লাগারই কথা। ঠিক আছে, তুমি এখন বাড়িতেই যাও। কয়েকদি থাকো। আবার যখন দরকার পড়বে, ঠিক জেলে পাঠিয়ে দেব।

পারিশ্রমিক পেলেন দুর্গাপুর

অনির্বাণ বসু

দুর্গাপুর নিয়ে তখন সমস্যা চলছিল। বাগড়া আসছিল দিল্লি থেকে। গোয়েন্দা দপ্তরের লোকজন বুঝিয়েছিল, দুর্গাপুরে শহর হলে আইনি সমস্যা দেখা দেবে। জঙ্গিদের ঘাঁটি হয়ে উঠবে। এতে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও।

দিল্লিতে চলছিল জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠক। ছিলেন সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ছিলেন কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরাও। ওড়িশার মন্ত্রী নিত্যানন্দ কানুনগোকে দেখেই মনে হল তিনি অসুস্থ। হঠাৎ মিটিং থামিয়ে দিলেন বিধানচন্দ্র। বললেন, জওহর, কানুনগো অসুস্থ, মিটিং থামাও।

বলেই দ্রুত ছুটে গেলেন কানুনগোর কাছে। নিজে চিকিৎসা করলেন। দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতালের ডাক্তাররা বললেন, খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা। আর আধ ঘণ্টা দেরি হলে হয়ত অঘটন ঘটে যেত। বোঝা গেল, সেই সময় বিধানবাবু মিটিং না থামিয়ে দিলে কানুনগো হয়ত সেদিনই মারা যেতেন। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হওয়ায় সেরে উঠলেন কানুনগো। যেন নুতন জীবন পেলেন।

এভাবে কেউ নতুন জীবন ফিরে পেলে তাঁর তো একটা কৃতজ্ঞতা থাকেই। বিধানবাবু হাসপাতালে দেখতে গেলেন। কানুনগো বললেন, আপনার জন্যই আমি জীবন ফিরে পেলাম। কী করে এই ঋণ শোধ করব, জানি না। দপ্তরে ফিরে কাজে যোগ দিলেন। একদিন বিধানবাবুর কাছে মজা করে জানতে চাইলেন, ডাক্তার, আপনার ফি'জ কত ? তখন বিধান রায় বললেন, ফিজ দিতে হবে না। তুমি জওহরকে ধরে দুর্গাপুরের ছাড়পত্র এনে দাও, তাহলেই চলবে। লেগে পড়লেন কানুনগো। বিধানবাবুর হয়ে তিনিই বোঝাতে লাগলেন, দুর্গাপুরের প্রকল্পটা কতটা জরুরি। নেহরুও বুঝলেন। একদিন হঠাৎ কানুনগো হাজির মহাকরণে। সঙ্গে দুর্গাপুরের ছাড়পত্রও।

মন্ত্রীকে বললেন, রোজ হাঁড়িয়া খাও

তরুণ পট্টনায়েক

ডুয়ার্সের মন্ত্রী দানিশ লাকরা। অনেকদিন ধরেই নানা রোগে ভুগছিলেন। সাহস হয়নি বিধান রায়কে বলার। কলকাতার নামী দু একজন ডাক্তারকে দেখালেন। লাভ হল না।

কথাটা বিধান রায়ের কানে গেল। জানতে চাইলেন, কী সমস্যা। দানিশ নিজের সমস্যার কথা বললেন। কিন্তু আসল কথাটাই চেপে গেলেন। আর সেটাই ধরে ফেললেন বিধান রায়।

বললেন, 'তোমরা গ্রামে হাঁড়িয়া মদ খাও। কিন্তু এখানে সেটা পাচ্ছো না। বিলিতি মদ তোমার পেটে সহ্য হচ্ছে না। সেই কারণেই তোমার সমস্যা।' দানিশ লাকরা কিছুটা যেন লজ্জা পেলেন।

বিধানবাবু বললেন, তোমাকে মদ ছাড়তে বলছি না। যখন কলকাতায় আসবে, দয়া করে বিলিতি মদ খেয়ো না। পারলে হাঁড়িয়া সঙ্গে নিয়ে এসো। নইলে এখানে কোথাও হাঁড়িয়ার ব্যবস্থা করো।

বলাই বাহুল্য, দানিশ লাকরার আর কোনও সমস্যা ছিল না।

পথের পাঁচালীর টাকা এসেছিল পিডব্লুডি থেকে!

সংহিতা বারুই

পথের পাঁচালী ছবির পরিচালক কে, সবাই জানেন। কিন্তু এই ছবির প্রযোজক কে? অনেকেরই হয়ত অজানা। সত্যিই তো, প্রযোজককে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়! কোনও সন্দেহ নেই, বাংলা ছবিতে পথের পাঁচালী একটি মাইলস্টোন। আর সেই মাইলস্টোনের সঙ্গে কোথাও একটা জড়িয়ে আছে বিধানচন্দ্র রায়ের নাম। কারণ, তিনি না থাকলে হয়ত এই ছবি দিনের আলোই দেখত না। চূড়ান্ত পর্বে এসে ছবিটির প্রযোজনা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন সুকুমার রায়। সত্যজিতের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। বাবার সান্নিধ্য কখনই পাননি। খুব অভাবের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। পারিবারিক সম্পত্তিও তেমন ছিল না। কলকাতার পড়া শেষ করে গেলেন শান্তিনিকেতন। তারপর যখন ছবি বানাতে নামলেন, হাতে তেমন পয়সা নেই। নিজের গয়না তুলে দিয়েছিলেন স্ত্রী বিজয়া রায়। শোনা যায়, কিশোর কুমার সেই সময় তুলে দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকায় কি আর সিনেমা হয়! ফলে, মাঝপথেই কাজ থমকে গেল।

ঠিক তখনই এগিয়ে এলেন বিধানচন্দ্র রায়। সত্যজিতের মায়ের বন্ধু ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তিনিই বারবার বিধান রায়কে অনুরোধ করেন ছবিটিকে সাহায্য করতে। কিন্তু সরকারের কাজ তো সিনেমা বানানো নয়। সরকারের তো অডিট হয়। খরচটা কোন খাতে দেখানো হবে? বিধানচন্দ্র জানতে চাইলেন, ছবির নাম কী? শুনলেন পথের পাঁচালী। ব্যাস, উপায় বেরিয়ে গেল। পথ আছে। গ্রাম বাংলা আছে। ব্যাস,

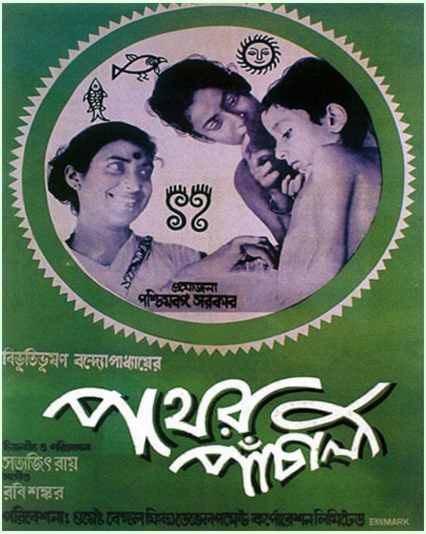

আর কী চাই! গ্রাম বাংলার পথের ওপর তথ্যচিত্র বলে চালিয়ে দেওয়াই যায়। টাকা এল পিডব্লুডি-র ফান্ড থেকে।

আইন আছে। আইনের ফাঁকও আছে। প্রচলিত আইনের বাইরে গিয়ে তিনি সাহায্য করলেন বাংলার উঠতি পরিচালককে (তখনও পর্যন্ত যাঁর একটি ছবিও তৈরি হয়নি)। ছবি মুক্তি পেল। শোনা যায়, কলকাতায় বিশেষ স্ক্রিনিং হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ছবিটা দেখিয়েছিলেন বিধান রায়। তারপর কী হয়েছিল, সে তো এক ইতিহাস।

চিকিৎসক বিধান রায়, প্রশাসক বিধান রায় বহু আলোচিত। কিন্তু চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান কতটুকুই আর আলোচিত হয়! সেদিন কঠিন সময়ে তিনি না পাশে থাকলে হয়ত পথের পাঁচালী তৈরিই হত না।

একটি আটপৌরে সভা

সেঁজুতি সেনগুপ্ত

আমার জন্ম বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর অনেক পরে। সুতরাং, তাঁকে কাছ থেকে দেখা তো দূরের কথা, দূর থেকে দেখার কোনও সুযোগও আমার সামনে ছিল না। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জানা, তা মূলত তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা পড়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে লেখা কি অনধিকার চর্চা? তাই যদি হয়, তাহলে তো রবি ঠাকুরকে নিয়ে কিছুই লেখা চলে না। এমনকী উত্তম কুমার বা সত্যজিৎ রায়কেও কখনও চোখে দেখিনি। তাঁদের নিয়েও লেখা চলে না। সে অর্থে কোনও দিকপালকে নিয়েই লেখা চলে না। আবার এঁদের নিয়ে লেখা গেলে বিধান রায় নিয়েও লেখা যায়।

ভনিতা থাক। একটি একেবারেই আটপৌরে সভার কথা তুলে ধরা যাক। বর্ষীয়াণ সাংবাদিক চিরঞ্জীবের লেখা থেকে ঘটনাটা জেনেছি। মনে হল, বেঙ্গল টাইমসের পাঠকদের কাছে তা তুলে ধরা জরুরি। সময়টা পাঁচের দশকের মাঝামাঝি। ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে ছাত্রদের একটি সভা। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার কথা বিধানচন্দ্র রায়ের। কাছেই তাঁর বাড়ি। তাই গাড়িতে নয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটেই চলে এলেন সভাস্থলে। বিশেষ নিরাপত্তাও ছিল না। কয়েক জন কনস্টেবল। আলাদা কোনও মঞ্চও ছিল না। শুধু একটা ছোট্ট লাউডস্পিকারে তিনি কয়েকটি কথা বলবেন। সভায় তখন মেরেকেটে শপাঁচেক ছাত্র। চার-পাঁচশো লোক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভা!

মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দেওয়া মানেই গুরুগম্ভীর একটা ব্যাপার। তিনি দেশের কথা বলবেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা বলবেন। রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে নিজের ঢাক পেটাবেন। ছাত্রদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেবেন। আমরা এগুলো দেখতেই তো অভ্যস্থ। কিন্তু তিনি বিধান রায়। এসব কোনও রাস্তাতেই গেলেন না। তিনি একেবারে আটপৌরে ঢঙে বলা শুরু করলেন। শুরুতেই বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে ডাক্তার হতে চাও? দশ-বারো জন হাত তুললেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তার মানে বাকি সবাই রোগী! হাসির রোল উঠল।

এবার বললেন, ভাল ডাক্তার কিন্তু বেশি ওষুধ দেয় না। এটা মাথায় রেখো। ভবিষ্যতের

ডাক্তারদের উদ্দেশে বললেন, বর্ষাকালে সর্দি–কাশি–জ্বর নিয়ে লোক আসবে। আর বিয়েবাড়ির সময় অম্বল, গ্যাস, পেটের গণ্ডগোল। এই মাথায় রেখে চিকিৎসা করতে হবে।' এরপর বাকি সবার উদ্দেশে বললেন কয়েকটা জরুরি কথা, 'যেটা খেতে ভাল, সেটা পেটের জন্য ভাল নয়। আবার যেটা পেটের জন্য ভাল, সেটা খেতে ভাল নয়। মুখরোচক খাবার বেশি খেও না। চানাচুর, সিঙ্গাড়া, ভাজাভুজি থেকে দূরে থাকবে। ওতে পেটের গণ্ডগোল বাড়ে। অনেকে ভাবে, পেট ভরে খাওয়া বোধ হয় খুব ভাল ব্যাপার। এটা একেবারেই ভুল। সবসময় পেটে জায়গা রেখে খাবে।'

এবার এলেন দইয়ের প্রসঙ্গে। 'ভোজবাড়িতে লুচি, মাংস, মাছ নিশ্চয় খাবে। তবে শেষপাতে মিষ্টি দইটি খেও না। ওটি কিন্তু বিষ। তোমাদের সব খাওয়া মাটি করে দেবে। তবে টক দই খেতেই পারো। তাতে ভাল হজম হবে। মিষ্টি দই কিন্তু একেবারেই নয়। আরও একটা কথা খুব ভাল করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। খেতে খেতে জল খেও না। এমনকী খাবার সঙ্গে সঙ্গেও জল নয়। খাবার বেশ কিছুক্ষণ পর জল খেতে পারো।' '

মূলত এসব নিয়েই ভাষণ। ভাবা যায়, একজন মুখ্যমন্ত্রী এরকম বার্তা দিচ্ছেন! কোনও লড়াইয়ের কথা নয়। দেশের স্বার্থে প্রাণ বাজি রাখার কথা নয়। অথচ, তাঁর যা পাণ্ডিত্য, যে কোনও বিষয় নিয়েই কথা বলতে পারতেন। আসলে, অল্পবিদ্যা সবসময়ই ভয়ঙ্করী। প্রকৃত জ্ঞানীরাই এমন সরল হতে পারেন। একেবারেই আটপৌরে সভা। কিন্তু মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো কথা। যাঁরা ছাত্রসমাজের জন্য বিরাট কোনও বার্তা নিয়ে হাজির হন, তাঁদের কথা হারিয়ে যায়। সভার পরেই লোকে ভুলে যায়। তিনি একেবারেই সাধারণ কথা বলতে পারতেন বলেই, এত বছর পরেও তাঁর কথা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাই এই আটপৌরে সভাই স্মরণীয় হয়ে থেকে যায়।

একটি পেরেকের কাহিনী

উত্তম জানা

দিন কয়েক আগের কথা। ফেসবুকে জানতে পারলাম, সাগরময় ঘোষের জন্মদিন। অনেকেই ছবি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। অনেকেই দু-চার কথা লিখছেন। দেশ পত্রিকার এই সম্পাদক সম্পর্কে বলা হয়, যিনি দারুণ লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না। কারণ, অন্যকে দিয়ে আরও ভাল লেখাটা লেখাতে চান।

সেদিনই খুঁজেছিলাম তাঁর লেখা ‘একটি পেরেকের কাহিনী’। বইটির কথা আগেই শুনেছি। নানা কারণে পড়া হয়ে ওঠেনি। এক বন্ধুর সৌজন্যে পেয়েও গেলাম। সম্ভবত ছিয়াশি পাতার বই। মনে হল, দ্রুত পড়ে ফেলি। সেই দিনই দ্রুত পড়ে ফেললাম। শেষ করেই উঠলাম।

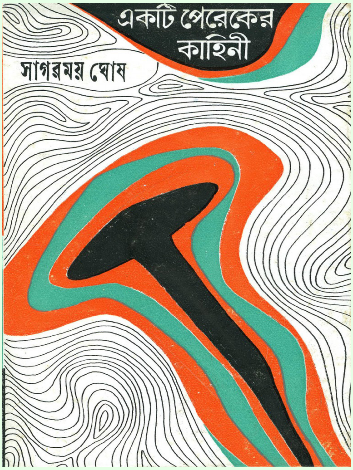

চিনলাম সাগরময় ঘোষকে। আরও ভাল করে বলতে গেলে, চিনলাম বিধানচন্দ্র রায়কে। তাঁর ডাক্তারি নিয়ে অনেক কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু তিনি যে কতবড় মাপের মানুষ, এই বইটি পড়লে তা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। তাঁর ডাক্তারিকে বোঝার এটি একটি আদর্শ বই। গ্রাম থেকে আসা এক যুবক। যে একটি চাকরি জোগাড়ের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে মহানগরের রাজপথে। তার পায়ে একটি পেরেক ঢুকে গেল। ভর্তি হতে হল হাসপাতালে। অনেকেই নিদান দিলেন, পা কেটে বাদ দিতে হবে। কিন্তু একজন ডাক্তার বুঝেছিলেন, এই রোগীকে সারিয়ে তোলা যাবে। তাঁর চিকিৎসায় সেরে উঠলেন সেই যুবক। সেরে তো উঠলেন। এবার যাবেন কোথায়? মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। চাকরি নেই। শেষমেষ সেই ডাক্তার বাবুকেই কিনা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হল। সেই ডাক্তারবাবুই হলেন বিধানচন্দ্র রায়।

এরপর সম্পর্ক আরও নিবিড় হল। রোজ সকাল আটটার মধ্যে পৌঁছে যেতে হয় ডাক্তারবাবুর বাড়ি। সেখানে কিছু জরুরি কাজ সেরে যেতে হয় হাসপাতালে। এভাবেই কাছ থেকে দেখেছেন ওই বনস্পতিকে। কত মজার ঘটনার নীরব সাক্ষী। একসময় একটি অপ্রীতিকর ঘটনায় বিধানবাবু তাঁকে ভুল বুঝলেন। বললেন, তুমি আমার নাম ডুবিয়েছো। আর কখনও আমার সামনে আসবে না। যুবক সব হারিয়ে আবার সেই নিস্ব। যেভাবেই হোক, বিধানবাবুর ভুল ভাঙাতেই হবে। রোজ সকালে বিধানবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিধানবাবু দেখেও দেখেন না। এভাবেই আস্তে আস্তে ভুল বোঝাবুঝি দূর হল।

পুরোটাই সেই বৈদ্যনাথের চোখ দিয়ে দেখা। সহজ সরল ভাষায় কী চমৎকার ছবি এঁকেছেন সাগরময় ঘোষ। এমন একজন মহান মানুষকে নিয়ে লিকতে গিয়ে কোনও পাণ্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা করেননি। মরমী কলমে তুলে এনেছেন সমসাময়িক কিছু ঘটনা। বিধান বাবুর জীবনী হয়ত অনেকেই লিখেছেন। তাতে নিশ্চিতভাবেই অনেক অজানা তথ্য আছে। কিন্তু এমন সহজ সরলভাবে আর কেউ তুলে ধরতে পেরেছেন! মনে হয় না। বইটি সবার পড়া উচিত। দ্রুত পড়ে ফেলুন।

বেঙ্গল টাইমস
bengaltimes.in
আলোর
পথযাত্রী